আন্ডেরসেন রূপকথার জীবন

সমীর সেনগুপ্ত

ডেনমার্কের ফীনেন দ্বীপের ওডেন্স শহরে, ১৮০৫ সালের ২ ডিসেম্বর, মুচি বাবা ও ধোপানি মায়ের সংসারে জন্মেছিলেন হান্স ত্রিশ্চিয়ান আন্ডেরসেন--- প্রায় তাঁর গল্পের কুচ্ছিত হাঁসের ছানাটার মতোই পৃথিবীর একটি অবহেলিত কোণায়। একটাই ঘর ছিল তাঁদের বাড়িতে, সেই ঘরটির বর্ণনা দিয়েছেন আন্ডেরসেন তাঁর একটি আত্মজীবনীতে (মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ)

...আমাদের একমাত্র ছোট ঘরটার সমস্ত জায়গাই প্রায় ভরাট থাকতো জুতো-শেলাইয়ের বেঞ্চি আর সাজশরঞ্জামে। তাছাড়া ছিলো বিছানা, একটা তক্তপোশ, আর আমার শোবার জন্য ক্যাম্পখাট। চার দেয়ালেই টাঙানোথাকত ছবি। বাবামশাইয়ের কাজ করার বেঞ্চির উপরে একটা কাবার্ডে থাকতো বইপত্র আর স্বরলিপির খাতা। ছোট্ট রান্নাঘরে ছিলো একসারি তামার থালা - বাসন---আর সেই ছোট্ট রান্নাঘরটির অল্প একটু ফাঁকা জায়গাই আমার কাছে অনেকখানি মনে হ'তো--- ঐটুকু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে যখন বসতুম, নিজেকে তখন মনে হ'তো মস্ত বড়লোক ব'লে। দরজার গায়ে কয়েকটা ল্যান্ডস্কেপ লাগানো ছিলো, আর তা-ই ছিলো আমার আর্ট - গ্যালারি।...

রোজকার খাবারটা কোনোমতে জুটত, কিন্তু ভরপেট সব সময় জুটত না, ভালো খাবার তো নয়ই। দু-চারটে বইপত্তরও ছিল বাড়িতে---ছিল একটি বাইবেল, দিনেমার সাহিত্যের জনক বলে যাঁকে মনে করা হয় সেই লুডভিগ হোলবার্গের নাটকের সংগ্রহ, একখণ্ড আরব্যরজনীর উপাখ্যান---কিন্তু ছেলেকে ভালো ইস্কুলে পাঠাবার সংস্থান ছিল না বাবা-মায়ের। আন্ডেরসেন পড়তে যেতেন গরিবদের দাতব্য বিদ্যালয়ে ; বাবা - মা তাকিয়ে থাকতেন সেই দিনের দিকে, যেদিন ছেলে বড়ো হয়ে কোনো একটা হাতের কাজটাজ শিখে নিজের খাওয়াপরার ব্যবস্থা নিজে নিজেইকরে নিতে পারবে। ছোট্ট হান্স একটু একাচোরা ছিল, অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারত না বেশি---সময় কাটত বই পড়ে, দিবাস্বপ্ন দেখে, কিম্বা নিজের পুতুলদের জন্যে জামা শেলাই করে। আর তাকে টানত শহরের থিয়েটারটি।সেকালের ডেনমার্কে কোপেনহাগেনের বাইরে ও ডেন্সেই ছিল একমাত্র শহর যেখানে ছিল একটি থিয়েটার। স্থানীয়অভিনেতারা ছাড়াও, মাঝে মাঝে কোপেনহাগেনের রয়্যাল থিয়েটার থেকে আসত ভ্রাম্যমাণ নাটকের দল, তখন থিয়েটারের দোররগোড়ায় দাঁড়িয়েই হান্সের সময় কেটে যেত। শহরের বাতাসে উড়ত রূপকথার রাজরানীদের গল্প, শহরটা তখনো আধুনিক হয়ে ওঠেনি। লিখেছেন আন্ডেরসেন তাঁর আমার জীবনের সত্যি গল্প নামে তাঁর প্রথম আত্মজীবনীতে (তিনটি আত্মজীবনী আছে তাঁর), কোথা থেকে তিনি গল্পের প্রথম স্বাদ পেয়েছিলেন। তাঁর ঠাকুমা কাজ করতেন ওডেন্সে শহরের হাসপাতালে; নামেই হাসপাতাল, আসলে, বর্ণনা পড়ে মনে হয়, সেটা ছিল একটা আধাদাতব্য বৃদ্ধাশ্রম। সেখানকার অধিবাসিনী নিরাশ্রয় বুড়িরা সুতো কেটে নিজেদের খাবারের সংস্থান করত, আর তাদের কাছ থেকে রূপকথার গল্প শুনত হান্স। বাড়ির আরব্যরজনী বইটার গল্পগুলোও পড়তে পড়তে প্রায় মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। বুড়িদের গল্প শুনতে শুনতে তার মনের মধ্যে রোমান্টিক কল্পনার হাজার প্রদীপ জ্বলে উঠত। ছোটবেলাকারএই রূপকথা শোনা ও পড়ার পরিপ্রেক্ষিতাটি থাকার ফলেই সম্ভবত তাঁর নিজের লেখা গল্পগুলো গল্প বলার দুটি পৃথক ভঙ্গির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। খাঁটি রূপকথার ভঙ্গিটি সরল, গ্রিমভ্রাতাদের বল

া গল্পগুলি যেমন, অথবা দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের। দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের গল্প বলা ভঙ্গিটির তুলনা করলেই বোঝা যাবে আমি কীবলতে চাইছি---শিশুদের গল্প শোনানোর সরল ও ছেলেমানুষি ভঙ্গি, এবং আধুনিক পৃথিবীর বইনির্ভর গল্পজগতের তির্যক ও বিদগ্ধ ভঙ্গি। ওডেন্সে সেকালে ছিল একটা গ্রাম্য শহর, গঞ্জ বললেই হয়; সেখ ানে চলিত ছিল অনেকপুরোনো আমলের রীতিনীতি, মানুষের মনে জমা হয়ে ছিল অনেক কুসংস্কার--- যেগুলো কোপেনহ াগেনে বসে কল্পনা করা যায় না। বালকের কল্পনাকে উত্তেজিত করে তুলতে এই সব উপাদানই কাজে লাগত।

গল্প লিখতে সে আরম্ভ করছিল ইস্কুলের নিচের ক্লাশে থাকতেই। তার সমবয়সীরা যখন হাডুডু কিম্বা গোল্লাছুটে মত্ত, এই ছেলেটি তখন নিজেদের ছোট্ট ঘরটিতে বসে কাগজের উপর কলম বুলিয়ে চলেছে। বাচচা ছেলে খেলাধুলো বাদ দিয়ে বসে বসে গল্প লিখছে এটাই আশর্চ্য হবার মতো, আরো বেশি করে অবাক লাগে যখন একটি মুচির ছেলেকে এই কর্মে মগ্ন থাকতে দেখি। দেখতেও সে ঢ্যাঙা, বিশ্রী---অবিকল কুচ্ছিত হাঁসের ছানাটার মতোই সাধারণ পাতিহাঁসেদের মধ্যে বেমান ান। মনের মধ্যে তার গোপন কিন্তু জ্বলন্ত উচচাশা, সে মঞ্চশিল্পী হবে--- হবে অভিনেতা, বা নাচিয়ে, বা গাইয়ে। বড়ো বড়ে া নাটকের অজস্র দৃশ্য তার মুখস্থ, অজস্র কবিতা মুখস্থ, যে শুনতে চায়, তার সামনেই হাতপা নেড়ে আবৃত্তি করে শুনিয়ে চলে শ্রোতা যতক্ষণ ক্লান্ত না হয়। গানের গলাটিও তার অসাধারণ, অনেকে তাকে ওডেন্সের নাইটিঙ্গেল বলে ডাকে। এই গানের জন্যেই ক্রমে নাম ছড়াতে আরম্ভ করল তার--- বড়লোকদের বাড়িতে পার্টি হয়, হান্সের ডাক পড়ে গান শোনাবার জন্যে। সেসব পার্টিতে সে একেবারেই বেমানান---তার পোশাকআশাকও নেই, আদবকায়দাও জানা নেই। নিমন্ত্রিতরা ত াকে দেখে মজা পান, আবার তার গানের গলা শুনে অবাকও হন। অভিজাততন্ত্রের প্রথা অনুযায়ী ডেনমার্কের সেকালের সমাজ কঠোরভাবে স্তরবিন্যস্ত ছিল। মুচির ছেলের পক্ষে ধনীগৃহে প্রবেশাধিকার পাওয়া অসম্ভবই, কিন্তু গানের গলায় জে ারে হান্সের সামনে তাদের কারো কারো দরজা খুলে যেত। এমন ঘটনা সব দেশেই মাঝে মাঝে ঘটে---ভাবলে মনে পড়বে পাঠকের, আমাদের দেশেও ঘটেছে,এর কাছাকাছি সময়েই। ১৮৩০ সাল নাগাদ বৌবাজারের রাধামোহন সরকার এক ফিরিওলার গলায় চাঁপাকলা--' ডাক শুনে তাকে ডেকে এনে চাকরি দিয়ে গান শিখিয়েছিলেন---তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন গোপাল উড়ে নামে, 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার স্টাইল বদলে দিয়েছিলেন সহজ সরল ভাষায় গান লিখে।

এই সমাজের উচচতম স্তরে একদিন বিচরণ করবে, সে, তার আবির্ভাবে দেশের যে কোনো ব্যারন ধন্য হয়ে যাবে, অভিজাত বাড়ির মেয়েরা সারা দুপুর ধরে সাজগোজ করবে সন্ধেবেলা তাকে অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পাবার আশায়; তো, সেই সমাজের সঙ্গে তার পরিচয় আরম্ভ হয়েছিল এইভাবে। এই সময়ের চিহ্ রয়ে গেছে তাঁর দেশলাইওয়ালির গল্পটিতে, ছে াট্ট ক্ষুধার্ত মেয়েটি যেখানে অবিরাম তুষারপাতের মধ্যে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে বড়লোকদের জানলার শার্শিতে নাক ঠেকিয়ে দেখছে, ভিতরে অগ্নিকুণ্ডের উষ্ণতা ঘিরে বয়ে চলেছে খাদ্যপানীয় নাচগানের অবিশ্রাম স্রোত।

আন্ডের্সনের প্রায় সব লেখাই নিজেকে নিয়ে। তাঁর আত্মজীবনীর সংখ্যাই তিন--তা ছাড়াও পণ্ডিতেরা বলেন, তাঁর অনেক লেখার মধ্যেই তাঁর জীবনের কোনো না কোনো ঘটনার ছায়া আছে। প্রায় নিরক্ষর মা তাঁর হান্সকেশোনাতেন তাঁর নিজের গরিব ছোটবেলার গল্প---তাঁকে পাঠানো হত ভিক্ষে করতে কিন্তু কারো কাছে কিছু চাইতে লজ্জা করত তাঁর; অথচ বাড়ি ফিরে যেতেও সাহস হত না, রক্তজমানো শীতে একটা সাঁকোর নিচে লুকিয়ে বসে কাঁদতেন তিনি। দেশলাইওয় ালির গল্পটিতে সেই ছোট্ট মেয়েটিকে চিনে নিতেও খুব বেশি কল্পনাশক্তি লাগে না।

বাবা মারা গেলেন তার এগারো বছর বয়সে। গরিব বাড়িটি আরো গরিব হয়ে গেল। হান্সকে যেতে হল একটা তাঁতের ক ারখানায় চাকরি করতে, তারপর একটা তামাকের কারখানায়---কোনোটাতেই সে টিকে থাকতে পারল না বেশিদিন। ইতিমধ্যে তার মা আবার বিয়ে করলেন, হান্স চেয়ে চেয়ে দেখল বাড়িতে যা কিছু তার বাবার জিনিশ বাবার জায়গা সব একটি অচেনা লোক এসে দখল করে নিল---এমনকী এরও জীবিকা জুতো শেলাই করা। বাড়ির প্রতি যেটুকু আকর্ষন ছিল তাও চলে গেল তার। মাকে বুঝিয়ে, চোদ্দ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে, ওডেন্সে শহর ছেড়ে,নিজের জমানো কয়েকটা টাকা পকেটে নিয়ে একা একা চলে গেল রাজধানীতে, কোপেনহাগেন-এ। সেখানে আছে নাকি অনেক সুযোগ, অনেক স্বপ্নের সত্যি হয়ে ওঠার ইতিহাস। স্বপ্ন দেখছে সেও, তাকে বড়ো হতে হবে, বিখ্যাত হতে হবে, ধনী হতে হবে। সেটা ১৮১৯ সাল। শহরের সবচেয়ে নামকরা থিয়েটার হল রয়াল থিয়েটার, সেখানে গিয়ে বহু চেষ্টায় সে মালিকের সঙ্গে দেখা করল। তিনি এই নোংরা, লেখাপড়া না জানা রাস্তার ছেলেটিকে একেবারেই আমল দিলেন না, রূঢ়ভাবে শুনিয়ে দিলেন, এসব বাজে

চিন্তা ছেড়ে দিয়ে অবিলম্বে একটা কোনো হাতের কাজ শিখে রোজগারের চেষ্টা দেখতে। ধাক্কাখেয়ে হান্স ফিরে এল, কিন্তু দমল না,; গিয়ে দেখা করল শহরের সহচেয়ে নামকরা নাট্যসমালোচকের সঙ্গে, তারপর সবচেয়ে নামকরা ব্যালে নর্তকীর সঙ্গে। দুজনের কেউই রাস্তার ছেলেটিকে খাতির করে কথা বললেন না, বাড়ি ফিরে যেতেই পরামর্শ দিলেন।

দিনের পর দিন কেটে যায়। হাতের সামান্য পয়সা দ্রুত ফুরিয়ে অসাছে; তাপমাত্রা শূন্যের অনেক নিচে, আধপেটা বেশি খাওয়া হয় না, কাটের জুতোর মধ্যে পা দুটো ঠান্ডায় জমে যেতে চায়, মোজা কেনবার পয়সা নেই। মরিয়া হান্স একের পর এক মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত বড়লোকদের গিয়ে ধরে, সকলেই ফিরিয়ে দেন তাকে। একদিন রয়্যাল কয়্যার স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চায়---তাঁর নাম ছিল সিবোনি। সিবোনি তখন লাঞ্চ খাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে বসেছিলেন তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত সুরকার, ওয়াইজে তাঁর নাম। ওয়াইজে নিজে গরিব অবস্থা থেকে উঠে এসেছেন, ছেলেটিকে দেখে, তার কথা শুনে তাঁর দয়া হল; তিনি চেষ্টাচরিত্র করে কিছু টাকা তুলে দিলেন হান্সকে। জোনাস কলিন নামে একজন উঁচুতলার মানুষ ছিলেন রয়্যাল স্কুলের একজন ডিরেক্টার, তিনিও টাকা দিয়েছেন কিছু, শুধু তাই নয়, নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সবাইকে তার গান শুনিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে সে যখন খুশি যেতে আসতে পারে। টাকাটা পেয়ে হান্স একটা বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া নিল, সিবোনির ইস্কুলে ভর্তি হল।রয়্যাল থিয়েটারের বেশির ভাগ শিল্পী সব এই ইস্কুল থেকেই আসে।

এইভাবে হান্সের জীবনের নতুন অধ্যায়ের আরম্ভ হল। দিনের বেলায় সে পড়াশোনা করে, সময় পেলে থিয়েটার হলের ভেতরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ডেনমার্কের থিয়েটারের স্বর্ণযুগ চলছে সেটা। বড়ো বড়ো অভিনেতা অভিনেত্রী, থিয়েটারের নামকরা সব মুবিব, দেশের যত নামকরা মানুষ, সকলকে সে চিনে ফেলল এইভাবে। রাতের বেলায় তাকে ঘুমোতে যেতে হয় ঝুপড়িতে, শহরের দীনতম অঞ্চলে। অনেকটা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই গল্পটার মতো---যে গল্পের নায়ক সারাদিন ফর্শা অ্যাপ্রন আর সোনালি পাগড়ি পরে এয়ার কন্ডিশন রেস্তঁরায় ওয়েটারের কাজ করে, সারা রাত দুর্গন্ধ বস্তিতে অসহ্য গরমে প্রচণ্ড মশার মধ্যে স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় শুয়ে রাত কাটায়। অনেক রাত্তিরই না খেয়ে কাটে---কিন্তু দীপেন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্রটির সঙ্গে উপমাটা এখানেই শেষ, কারণ যেটুকু পয়সা তার হাতে আসে হান্স খরচ করে বই কিনতে। ওডেন্সে-র মতো এখানেও সে তার গানের গলার জন্যে বড়োমানুষদেরপার্টিতে নেমন্তন্ন পেতে আরম্ভ করল। পার্টিতে গিয়ে সে মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান গায়---যারা গান বোঝে তারা তার গলারকাকাজে অবাক হয়ে যায়, যারা বোঝে না তারা তার গাঁইয়া হাবভাব নিয়ে হাসাহাসি করে। যে টাকাটা সে জলপানি হিশেবে পায় সেটা সামান্য ও অনিয়মিত, তাতে খিদেকে খুব বেশি দূর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তার ওপরে আছে তার বই কেনার বাতিক ---সেই উনিশ শতকের প্রথম পাদে, মুদ্রণশিল্প ও কাগজশিল্পের শৈশবকালে বইয়ের দামও ছিল আকাশছোঁয়া, কিন্তু বই না কিনে পারত না হান্স। অপরের দয়ায় কোনোমতে টিকে থাকার এই তিনটে বছর হান্সের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল। এই সময়ের প্রতিচ্ছবি পড়েছে তার অনেক বছর পরে লেখা 'ছোট্ট জলপরী' গল্পে, যেখানে মৎস্যকন্যা উৎসর্গ করে দিল তার জীবনের যা কিছু সম্পদ--- ছেড়ে এল তার পরিবার, তার ছোটোবেলার প্রিয় পৃথিবী-এ আশায় যে সে প্রবেশ করতে পারবে মানুষের জগতে, অধিকার পাবে অমরতার---কিন্তু সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করল যে সে জগতে বহিরাগত হয়েই থাকতে হবে তাকে, পুরোপুরি তাদেরি একজন বলে সে গৃহীত হবে না কখনো, তাকে কেউ বুঝতে পারবে না, বোঝবার চেষ্টাও করবে না। তার প্রিয়তম, যার জন্যে সে চিরতরে ছেড়ে এসেছে তার জলপরীর জগৎ, সেই রাজপুত্র তাকে ভালোবাসবে যেভাবে সে ভালোবাসে তার পুতুলকে, কিন্তু তার প্রিয়তম হবে অন্য আরেকজন।

কিন্তু সে এখনো অনেক দূরের কথা; কিশোর হান্স আপাতত এটুকু ভাবতে পেরেই খুশি যে যতই অসম্মানের মধ্যে তাকে এখন দিন কাটাতে হোক, সে অন্তত তার স্বপ্ন সার্থক হবার প্রথম ধাপটায় পা রাখতে পেরেছে---এই পথের শেষে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে রঙ্গমঞ্চের ঝলমলে জীবন। সে বিখ্যাত নাটকের বিখ্যাত দৃশ্যগুলি মুখস্থ করে, নিজে নিজে সবগুলো ভূমিকায় অভিনয় করে, বিয়োগান্ত নাটক লেখার চেষ্টা করে, রয়্যাল থিয়েটারের সঙ্গে সংলগ্ন নাচের ক্লাশে গিয়ে নাচ শেখে।

কিন্তু সতেরো বছর বয়স থেকে তার গলার স্বর বদলাতে আরম্ভ করল; নাচের ইস্কুলের বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিলেন, তার মতো শ্রীহীন ও আখাম্বা একখানা শরীর নিয়ে বড়ো নাচিয়ে হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। ইস্কুলে তাকে ডেকে বলে দেওয়া

হল, রঙ্গমঞ্চে তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

বাবার মৃত্যুর পর প্রথমবার, তারপর এখন দ্বিতীয়বার সংকট এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল; ভেঙে পড়ারই কথা ছিল, কিন্তু সারাজীবন ধরে তার প্রধান জোর ছিল নিজের উপর অসম্ভব, অনমনীয় বিশ্বাস। যতবার, যত রূঢ়ভাবেই প্রত্যাখ্যাত হোক, হারবে না সে সফল তাকে হতেই হবে, যেভাবেই হোক, যে ক্ষেত্রেই হোক।

নাটকের স্কুল থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হান্স বুঝতে পারল, লেখাপড়াটা ভালো করে না শিখলে কোনো পথেই এগোনো যাবে না। কলিন ব্যবস্থা করে দিলেন---জলপানিটুকু সম্বল করে সে গিয়ে ভর্তি হল গ্রামার স্কুলে, কোপেনহাগেন থেকে ৫৭ মাইল দূরে স্লাগেল্‌জে বলে এক মফস্বল শহরে। যে ক্লাশে সে ভর্তি হতে পারল সে ক্লাশের ছেলেদের গড় বয়সের চেয়ে তার বয়স অন্তত ছ'বছর বেশি, তৎসত্ত্বেও সে তাদের চেয়ে পড়াশোনার নানা ব্যাপারে পেছিয়ে। এবং সব চেয়ে যা বড়ো কথা, ক্লাশে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে মাস্টারমশায়ের বক্তৃতা শোনবার মনটাই তার আর নেই। তবু ক্লাশ করতে লাগল সে। দাঁতে দাঁত চেপে---সে যে পারে এই কথাটা নিজের কাছে প্রমাণ করতে হবে তাকে---তা ছাড়া জোনাস কলিন আছেন, কোপেনহাগেনে তার আরো কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী আছেন, তাঁদের কাছেও প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু গ্রামার স্কুলের জীবন এমনিতেই কঠিন, সাধারণ ভালো ঘরের ছেলের পক্ষেও বেশ কঠিন। স্কুলের হেডমাস্টারমশাইটি সেকেলে, ছাত্রদের নানাভাবে হেয় করে, বিদ্রূপ করে, শাস্তি দিয়ে সুখ পান। মুচিদের বাড়ির এই ধেড়ে ছেলেটা তাঁর চকচকে বড়লোকদের স্কুলে এসে ভর্তি হোক এটা একেবারেই চাননি তিনি, কিন্তু জোনাস কলিনের অনুরোধ ফেলতেও পারেননি। ফলে তার প্রতি তিনি বিশেষভাবে নির্দয়। প্রতি পদক্ষেপে তাকে তিনি বুঝিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর যে এই স্কুলে পড়তে আসা তার পক্ষে আস্পর্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়, তার পক্ষে এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে জাতব্যবসায় ফিরে যাওয়াই সুবুদ্ধির কর্ম।

হান্স আন্ডের্সেনের জীবনী পড়তে গিয়ে বারেবারেই একথা আমাদের মনে না হয়ে পারে না যে তাঁর পুরো জীবনটাই যেন গল্পের বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা; অনেকটা এই ধরনের গল্পই আমরা পড়ি নি কি ছোটবেলায়, লাস্ট বয় নামে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের সেই ছোট্ট বইটিতে? সে বই এখন আর কেউ পড়ে না বোধহয়। দক্ষিণারঞ্জন আন্ডের্সনের জীবনী পড়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন রূপকথার জগতের মানুষ, তাঁর পৃথিবীর রূপকথা বইতে আন্ডের্সনের গল্পের অনুবাদও করেছিলেন, তাঁর লেখার মধ্যে আন্ডের্সেনের জীবনের ছায়া আবিষ্কার করে আমাদের অবাক লাগে না। ছেলেবেলায় এই ধরনের গল্প পড়ে আমরা কেঁদেছিও হয়ত, কিন্তু এমন যে হতে পারে তা পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি, যতদিন আন্ডের্সেনের জীবনী না পড়া হয়ে উঠল।

হান্সকে হেডমাস্টারমশাই কড়া বারণ করে দিয়েছিলেন, সে যেন নিজে নিজে গপ্পো লেখবার চেষ্টা না করে। রচনার ক্লাশে তার লেখাগুলো ছিল বিশেষভাবে তাঁর বিদ্রুপের লক্ষ্য--- এইটে হান্সের কোনোমতেই সহ্য হত না। চার বছর ধরে তাঁর অত্যাচার সহ্য করল হান্স। তার মনে হতে লাগল আর কিছুদিন এখানে কাটাতে হলে পাগল হয়ে যাবে সে। স্কুলের বীভৎসতার বর্ণনা দিয়ে লম্বা চিঠি লেখে জোনাস কলিনকে, কলিন সেগুলোকে ধরে নেয় বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক আত্মকণ প্রকাশ বলে; স্লাগেল্‌জের গ্রামার স্কুল তো বিখ্যাত স্কুল, সেখানকার সম্বন্ধে এত অভিযোগের কারণ বুঝতে পারেন না তিনি। কিন্তু একদিন হান্সের আর সহ্য হল না। 'মুমূর্ষু বালক' নামে একটি কবিতায় হেডমাস্টারমশাইয়ের প্রতি নিজের মনোভাব বেশ স্পষ্ট করে প্রকাশ করল সে, তারপর কবিতাটি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে কোপেনহাগেনে ফিরে এল। ১৯২৬ সালে --- সান্সের বয়স চলছে একুশ।

স্কুল ছাড়ল, পড়াটা কিন্তু ছাড়ল না হান্স। বরং ভালো ভালো মাস্টারমশাই খুঁজে বের করে তাঁদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে পড়তে আরম্ভ করল। কলিনদের পরিবারের সঙ্গে এখন অনেকটা সময় কাটে, দু'বেলার খাওয়াটাও সেখানেই জুটে যায়---তা ছাড়া আরো কয়েকটি ধনী পরিবার আছে যারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল। তবে কলিন পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, ওবাড়িটা প্রায় তার নিজের বাড়ির মতোই। জোনাসকে সে প্রায় তার পিতার মতোই মান্য করে; তাদের পাঁচটি ছেলেমেয়েও তার কাছে নিজের ভাইবোনেরই মতন, তারাও এই অদ্ভুত ছেলেটিকে তাদের পরিবারেরই একজন বলে ধরে নিয়েছে। কোপেনহাগেনের অভিজাত সমাজের উচ্চতম স্তরে বিচরণশীল এই পরিবারটির পক্ষে হান্সের মতো একটি হতদরিদ্র ছোটোলোকের ছেলেকে যতদূর পর্যন্ত স্বীকার করা সম্ভব, আন্ডের্সেন-বিশেষজ্ঞদের লেখা পড়ে মনে হয়, তার চেয়ে বেশিই মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা তাকে, ক্রমে তাকে পালিত পুত্রের মর্যাদা দান করেছিলেন; তাঁদের বাড়ির উৎসবে

অনুষ্ঠানে আজকাল হান্স উপস্থিত থাকে---প্রথমদিককার মতো ভাড়া করা গাইয়ে হিশেবে নয়, পরিবারের বন্ধু হিশেবেই---কিন্তু হান্সের তবু মন ভরে না। তার মনে হয়, কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, তাদের একজন হয়েও যেন সে ঠিক তাদের একজন নয়। শেষ জীবনে, যখন তাঁর পৃথিবীজোড়া খ্যাতি, তখনও তাঁর মনে হত, কলিনপরিবারের কাছে তিনি ঠিক যেন পরিবারের একজন নন, ওডেন্সে-র সেই মুচিদের ছেলে, কলিনপরিবার যাকে আদর দিয়ে জাতে তুলে নিয়েছে।

সবচেয়ে জটিল সম্পর্ক তার জোনাসের তৃতীয় সন্তান এডোয়ার্ডের সঙ্গে; সে আন্ডেরসেনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।পণ্ডিতরা এখন বিশ্বাস করেন, তাদের সম্পর্কটা মূলত ছিল প্রেমের---যেমন প্রেম ওই বয়সের দুটি ছেলের মধ্যে হওয়া সম্ভব, এবং কখনো কখনো হয়ে থাকে। একে সোজাসুজি সমকামিতা আখ্যা দিলে অতিসরলীকরণ হয়ে যাবে।ওই বয়সের একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের মধেও, প্রেমের সম্পর্ক দেহনির্ভর না হয়েও আকর্ষণে তীব্রতম হতে পারে, দুটি মেয়ের মধ্যেও সেই রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়; সেই একই সম্পর্ক ওই আশর্চ্য বয়সে দুটি ছেলের মধ্যে হওয়াটাও কিছু অসম্ভব নয়, আমাদের আশেপাশে তাকালেই এর দৃষ্টান্ত আমরা আবিষ্কার করতে পারব। আমাদের সমসাময়িক কালে এই ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর শেষ কৈশোরের বন্ধু তন্ময় দত্তের, সেকথা তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন তাঁর প্রিয়সখী চিরা শ্যামের কাছে, চিরারস্মৃতিকথায় তার সবিস্তার উল্লেখ আছে। শক্তির প্রথম যৌবনের বহু বিখ্যাত কবিতা (যেমন ''বড়ো দীর্ঘতম বৃক্ষে বসেআছে দেবতা আমার'') এই সম্পর্কের কথা স্মরণ করে রচিত, তাও শক্তি সেখানে বলেছেন।

সম্পর্কটা ছিল অবশ্য মূলত একপাক্ষিক---তীব্রতা ছিল হান্সের দিক থেকেই, এডোয়ার্ডের দিক থেকে নয়। এডোয়ার্ড হান্সকে নানা ভাবে সাহায্য করলেও তার দিক থেকে ভাবাবেগের তেমন কোনো আতিশয্য ছিল না। জীবনীকাররা লিখেছেন, এডোয়ার্ড হান্সকে সারা জীবনই 'তুমি' (De) বলে সম্বোধন করেছে, কখনো 'তুই' (Du) বলেনি। কিন্তু এমনই ঘনিষ্ঠ ছিল তাঁদের বন্ধুতা যে পরে তাঁরা নিজেদের সমাধিস্থলও নির্বাচন করেন একসঙ্গে, কোপেনহাগেন ক্যাথিড্রালের সমাধিক্ষেত্রে, যদিও কলিন পরিবারের নিজস্ব পৃথক সমাধিক্ষেত্র ছিল। সেখানে আন্ডেরসেনের স্থান হবে না বলেই তাঁরা সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে এই জায়গাটি নির্বাচন করেছিলেন। সেখানে পাশাপাশি কবর দেয়া হয় আন্ডেরসেন, এডোয়ার্ড ও এডোয়ার্ডের পত্নী (আন্ডেরসেন বিবাহ করেননি) হেনরিয়েটাকে; ১৯২০ সালে কয়েকটি পারিবারিক কারণে কলিন পরিবারের এক সদস্য (তাঁরও নাম ছিল আন্ডেরসেন) এডোয়ার্ড ও হেনরিয়েটার সমাধিফলক সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে স্থাপন করেন--- নির্বচিত জায়গাটিতে রয়ে যায় আন্ডেরসেনের নিঃসঙ্গ সমাধিফলকটি, এখনও সেটি সেখানেই রয়েছে।

কোপেনহাগেনে ফিরে আসার এক বছর পরে আন্ডেরসেন (এখন তিনি সাবালক, তাঁকে আর হান্স বলে উল্লেখ করা যায় না) লিখলেন তাঁর প্রথম বই, সুদীর্ঘ তার নাম ---হোলমান খাল থেকে আমাগের -এর পূর্ব প্রান্ত অবধি পায়ে হেঁটে ভ্রমণ, ১৮২৮ ও ১৮২৯ সালে। এক তণ কবি কোপেনহাগেনের রাস্তায় রাস্তায় একটি পুরো রাত ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছে---- তার স্বপ্নময় বর্ণনা। স্বভাবতই কোনো প্রকাশক জোগাড় করা গেল না---তণ লেখকের প্রথম বই, তায় চমকপ্রদভাবে ঐতিহ্যবহির্ভূত রচনা, কে আর সাহস করে ছাপবে। কিন্তু আন্ডেরসেন দমে যাবার পাত্র নন, নিজেই টাকাপয়সা জোগাড় করে ছাপলেন--- এবং কী আশর্চ্য, লেগে গেল বইটা, দ্রুত ফুরিয়ে গেল সংস্করণ। তারপর লিখলেন একটি নাটক--- এবং কিমাশর্চ্য, রয়্যাল থিয়েটার গ্রহণ করল নাটকখানা। সেই রয়্যাল থিয়েটার, যেখান থেকে ছ'বছর আগে তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন---তাঁকে বলা হয়েছিল মঞ্চে তাঁর কোনো ভবিষ্যৎ নেই! সেন্ট নিকোলাস টাওয়ারের চূড়ায় প্রেম নামে নাটকখানা চললও ভালোই। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-দুটি পরীক্ষায় ভালোভাবেই পাশ করেছেন তিনি; এবার লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে শুধুই লেখায় মন দিলেন---এখন তাঁর প্রথম কবিতার বইটি বেরোবে।

তবে এই প্রথম সাফল্যের ফলে তাঁর পরবর্তী জীবন যে সঙ্গে সঙ্গেই কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে গেল তা কিন্তু নয়। তাঁর লেখকজীবনের প্রথম অংশ বহু উত্থানপতনের ইতিহাসে ভরা। দিনেমার পত্রিকাগুলোতে তাঁর লেখার সম্পর্কে খারাপ সমালোচনা ছাপা হল অনেক। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রথম সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হলেন অনুবাদে, জার্মনিতে। তাঁরপ্রথম উপন্যাস উদ্ভাবক বেরোল ১৮৩৫ সালে। তাঁর প্রথম রূপকথার সংগ্রহ ছোটদেরত জন্য রূপকথা-ও এই বছরই বেরোল, কিন্তু আন্ডেরসেন ভেবেছিলেন, তাঁর উপন্যাসই তাঁকে বিখ্যাত করবে। করেওছিল বিখ্যাত---উদ্ভাবক উপন্যাসটি বেরোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

ই জার্মানভাষায় অনূদিত হল, তারপর অন্যান্য বেশ কয়েকটি ভাষায়। বিদেশে এভাবে প্রতিষ্ঠা পাবার পর দেশের মধ্যেও তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে ভাবনাচিন্তা আরম্ভ হল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সাহিত্যিক জীবনেও তেমনি একবার তিনি সাদরে গৃহীত হয়েছেন, একবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। জার্মানিতে যখন পাঠক ও সমালোচকবর্গ তাঁর প্রশংসায় মুখর, ঠিক সেই সময়েই দেশের পত্রিকায় পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে সমালোচনা আর থামছে না।

আন্ডেরসেনের বই প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয় ১৮২৯ থেকে; তাঁর খ্যাতির আরম্ভ মোটমুটি ১৮৩৫ থেকে, জার্মানিতে তাঁর উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে; তাঁর ছোটদের জন্যে গল্পগুলিও বেরোতে আরম্ভ করেছিল এই সময় থেকেই, তবে বিশেষভাবে এই গল্পের জন্যে তাঁর খ্যাতির আরম্ভ হয় ১৮৩৯ থেকে। ১৮৪০-এরদশকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজিভাষার জগতে তাঁর বিপুল খ্যাতির আরম্ভ হল। তাঁর লেখা ছোটদের জন্য গল্পের মোট সংখ্যা হল ১৫৪।

আরেকটা কথা আন্ডেরসেন বুঝতে পারেননি। সেই তণ বয়সে---যে, উপন্যাস তাঁকে তখনকার মতো বিখ্যাত করবে হয়তো, কিন্তু তাঁকে অমর করবে খানিকটা অবহেলাতেই লেখা তাঁর রূপকথার গল্পগুলি। অ'াজ তাঁর উপন্যাস বা নাটকের খবর খাস ডেনমার্কেই ক-জন রাখে বলা কঠিন, কিন্তু তাঁর রূপকথাগুলি? সারা পৃথিবীতে এক বাইবেল ছাড়া আর কোনো বইয়ের এতগুলি ভাষায় অনুবাদ হয়নি। আমাদের বাংলাতেও বহুকাল আগেই অনুবাদ হয়েছে তাঁর গল্পের, তাঁর জীবৎকালেই হয়েছে রবীন্দ্রনাথেরও জন্মের আগে---মধুসূদন মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করেছিলেন তাঁর 'কুৎসিত হংসশাবক ও খর্বকায়ার বিবরণ', ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বেরিয়েছিল ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি থেকে--- জানিয়েছেন বাণী বসু তঁার বাংলা শিশুসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী - তো 'বাংলা সাহিত্যে হান্স আন্ডেরসেনের প্রভাব---অনুবাদে, শিশুসাহিত্যে ও বয়স্কপাঠ্য সাহিত্যে' এই বিষয়ে কেউ একটি গবেষণাপত্র রচনা করলে নেহাৎ ছোট হবে না সেটি।

বিত্রির দিক দিয়ে দেখলেও, তাঁর রূপকথার মতো এত বিত্রি হয়নি আর কোনো বইয়ের---সময়ের হিশেবে ধরা যায় যদি---না বাইবেল, না শেক্সপিয়র, না গ্রিম, না বানিয়ান। এই সূত্রে আরো একজন লেখকের কথা মনে না পড়ে পারে না আমাদের তিনিও রূপকথা লিখেছিলেন খেলাচ্ছলে, আর উপন্যাস লিখেছিলেন মন দিয়ে--- আন্ডেরসেনের পঞ্চাশ বছর পরে অবশ্যি---আন্ডেরসেনের মতো তিনিও ভেবেছিলেন উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হবেন। তাঁরছ'টি উপন্যাসের মধ্যে একটি কি দুটির নাম জানে আজকালকার সাহিত্যের ছাত্ররা, বাকিগুলো মুখ গুঁজে আছে ইতিহাস বইয়ের পাতায়; কিন্তু সামান্যই ক'টি রূপকথা তিনি লিখেছিলেন, সেই গল্পগুলো পড়েনি এমন পড়তে - জানা মানুষ বোধহয় সারা পৃথিবীতেই নেই---সেই সব সুখী রাজপুত্র আর স্বার্থপর দৈত্যদের নিয়ে লেখা গল্প।

ত্রমে দেশের পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল তাঁর রূপকথার গল্পগুলি; এরকম গল্প শুধু দিনেমার সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর সাহিত্যেই কখনো দেখা যায়নি এর আগে। উনিশ শতকে শিশুসাহিত্য বলতে ছিল শুধু বড়ো বড়ো গম্ভীর উপদেশ, একঘেয়ে সব কথামালা, যা পড়ে শিশুরা তৎকালীন খৃষ্টান মূল্যবোধ অনুযায়ী ধার্মিকও পুণ্যবান হয়ে উঠতে পারে। যাকে গল্প বলে, অর্থাৎ সৎসাহিত্য, যার দুঃখ ও আনন্দের বিচিত্র সব স্বাদের মধ্যে দিয়ে জীবনের গভীর অর্থের বোধ ত্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠে, শিশুদের জন্যে তার কোনো ধারণাই তখন পর্যন্ত তৈরিহয়নি। আন্ডেরসেনের বছর কুড়ি আগে জার্মানিতে জন্মেছিলেন গ্রিম ভাইরা---জ্যাকব ও উইলহেল্ম -- তাঁরা যেসব লোককথার সংকলন করেছিলেন সেগুলো অনেক দূরে সরানো ছিল সমসাময়িক দেশকাল থেকে। 'ওয়ন্স আপন আ টাইম' দিয়ে গল্প আরম্ভ হত তাঁদের, 'অ্যান্ড দে লীভ্ড হ্যাপিলি এভর আফটার' দিয়ে শেষ হত। আর আন্ডেরসেন তাঁর গল্প আরম্ভ করলেন কোপেনহাগেন শহর থেকে, সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে---তাঁর গল্প ভরে থাকে সাধারণ সব চেনা জিনিশে, দেশলাই, জুতো, খেলা, বাসনপত্র দিয়ে। আর অনেক বিখ্যাত গল্পের শেষেই তাঁর চরিত্ররা মরে যায়। হেরে যায়, ফুরিয়ে যায়। দুঃখ যে সুখের বিপরীত শব্দ নয়, দুঃখ যে বেঁচে থাকার অন্যতম উপাদান, সংবেদনশীল জীবনের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন, ছোটদের গল্পে একথা প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন আন্ডেরসেন। আর তাই তাঁর গল্প শুধুই ছোটদের গল্প নয়, ছোটবড়ো সকলেই তাঁর গল্প উপভোগ করতে পারে। প্রথম যে শিশু ধরে ধরে অক্ষর চিনতে শিখছে, আর বিশ্রুত যে পণ্ডিত পৃথিবীর সব বই পড়ে ফেলেছেন, উভয়ের কাছেই আন্ডেরসেন---যদিও হয়তো ভিন্ন ভিন্ন অর্থে---সমানভাবে আকর্ষণীয়।

গল্প বলার যে প্রথম শর্ত---যে, গল্প ত্রমশ চেনা জিনিশগুলোকে, চেনা মানুষগুলোকে অচেনা পরিমণ্ডলে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে, সে শর্ত শিশুসাহিত্যে প্রথম পূরণ করলেন আন্ডেরসেনই। তাঁর গল্প পড়তে নিয়ে শিশুপাঠকরা দেখে, খুবই

চেনা জায়গা থেকে আরম্ভ হয়ে গল্পগুলো তাদের ক্রমে অচেনা পৃথিবীতে নিয়ে যায়। তাঁর গল্পে কোনো উপদেশ নেই, নীতিবোধের আতিশয্য নেই, কিন্তু তাঁর বলবার ভঙ্গিটি এমন যে নিজের অজানিতেই শিশুরা নিজেদের নীতিবোধ নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারে---এমন সব প্রচ্ছন্ন উপদেশ, যা তারা নিজেরাই কখনো কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে জীবনের কাছ থেকে। আন্ডেরসেন উপদেশ দেন না, বেঁচে থাকতে শেখান। তাঁর গলার আওয়াজ নিচু, প্রায় যেন ফিশফিশ করে গল্প বলেন তিনি, তার মধ্যে মিশে থাকে মানুষের গায়ের গন্ধ নিয়মের রাজত্বকে তুচ্ছ করবার মন্ত্র।

আন্ডেরসেনের নিজের জীবনের মধ্যে--অন্তত তার প্রথমার্ধে---রূপকথার উপাদান প্রচুর। হতদরিদ্রের ঘরেজন্ম নিয়ে বিপুল খ্যাতি ও অর্থের মধ্যে মৃত্যু। পৃথিবীময় তাঁকে ঘিরে উৎসব, নানা দেশের রাজারাণীদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা। আজকের দিনে তিনি মূলত শিশুদের গল্পলেখক বলেই পরিচিত। কিন্তু জীবৎকালে তাঁর অন্যান্য লেখাগুলির খ্যাতিও কম ছিল না। ছটি উপন্যাস, পাঁচটি ভ্রমণকাহিনী, তিনটি আত্মজীবনী া স্মৃতিকথা, বহু কবিতা ওনাটকের তিনি রচয়িতা। আজ তাঁকে পৃথিবীর মানুষ প্রধানত জানে সরল ও নিষ্পাপ রূপকথার লেখক হিশেবে, প্রায় যেন তাঁরই কোনো কাহিনী থেকে উঠে আসা চরিত্র। কিন্তু আন্ডেরসেনের নিজের ও তাঁর সমসাময়িক লোকেদের চিঠিপত্র ও ডায়েরিগুলির মধ্যে তাঁর সম্পূর্ণ অন্য এক পরিচয় প্রকাশ পায়। বোঝা যায়, এই প্রখর ধীশক্তির অধিকারী,উচচাভিলাষী, সংগ্রামশীল মানুষটির আত্ম ছিল বেদনাদীর্ণ। তাঁর রূপকথাগুলিও, দিনেমার ভাষায় না হলেও অন্তত যদি ঝিস্ত অনুবাদে পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে, অনুবাদের অনুবাদে, পুনঃকথনে ও সিনেমা-টিভি-কমিক্স- এর খপ্পরে পড়ে সেগুলির যে চেহারা আজ দাঁড়িয়েছে আসলে তারা তার চেয়ে অনেক বেশি বক্রোক্তি ও তির্যকতাময়, সাধারণ রূপকথার তুলনায় তাদের মধ্যে অর্থের নানা স্তর ও বিভঙ্গের গভীরতা অনেক বেশি। আন্ডেরসেন আদৌ সরল পথের পথিক ছিলেন না; তাঁর রচনায় ঐর্যের জটিলতা, সাহিত্যিক দক্ষতা মানবচরিত্র অনুধাবন করবার, ও সেই ভাবনাকে আপাতসরল ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা, এবং সেই সঙ্গে সমকালীনতা ---তাঁরসময়কার ডেনমার্ককে প্রতিফলিত করবার ক্ষমতা তাঁকে পৃথিবীর বিরলতম কাহিনীকারদের সঙ্গে একাসনে বসাতে পারে।

হান্স আন্ডেরসেন কালপঞ্জি

১৮০৫ জন্ম, ফীনেন দ্বীপের ওডেন্স শহরে। ডেনমার্কে, এপ্রিল ২। জার্মান রূপকথার সংগ্রাহক গ্রিম ভ্রাতারা তাঁর চেয়ে কুড়ি বছরের বড়ো--- জ্যাকবের জন্ম ১৭৮৫, উইলহেল্ম ১৭৮৬। চার্লস ডিকেন্স তাঁর চেয়ে সাত বছরের ছোট। অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর চেয়ে ৪৯ বছরের ছোট, জেম্স ব্যারী (পিটার প্যান - এর লেখক) তাঁর চেয়ে ৫৫ বছরের ছোট ।

১৮১৯ ওডেন্সে ছেড়ে রাজধানী কোপেনহাগেন -এ এলেন।

১৮২২/২৭ ইশকুলে পড়ছেন--ল্লাগেল্জে-তে, পরে এলসিনোরে - তে।

১৮২৮ কোপেনহাগেন ঝিাবিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করলেন।

১৮২৯ প্রথম বই বেরোল; উপন্যাস হোলমান খাল থেকে আমাগের -এর পূর্বপ্রান্ত অবধি পায়ে হেঁটে ভ্রমণ, ১৮২৮ ও ১৮২৯ সালে, এবং নাটক সেন্ট নিকোলাস টাওয়ারের চূড়ায় প্রেম।

১৮৩০ কবিতার বই বেরোল।

১৮৩১ প্রথমবার জার্মানি ভ্রমণ। প্রথম ভ্রমণকাহিনী।

১৮৩৩/৩৪ কবিতাসংকলন প্রকাশ। ফ্রান্স ও ইটালি ভ্রমণ, প্যারিসে হাইনরিশ হাইনে ভিক্টর হুগোর সঙ্গে পরিচয়। মিউনিক ও ভিয়েনা ঘুরে দেশে ফিরলেন।

১৮৩৫উপন্যাস বেরোল, উদ্ভাবক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ হল জার্মান ভাষায়, বিপুল খ্যাতি হল সে দেশে। প্রথম গল্পসংকলনও বেরোল, শিশুদের জন্য রূপকথা।

১৮৩৫/৪১ ক্রমে ক্রমে রূপকথার আরো পাঁচটি সংকলন বেরোল।

১৮৩৬ উপন্যাস ও.টি।

১৮৩৭ উপন্যাস শুধু একজন বেহালাবাদক। সুইডেনে বেড়াতে গেলেন।

১৮৩৯ উপন্যাস ছবি ছাড়া ছবির বই।
১৮৪০ নাটক দো - আঁশলা (ইংরেজি অনুবাদে নাম 'মুলাটো', অর্থাৎ যার বাবা - মায়ের একজন সাহেব ও অন্যজন নিগ্রো); মূরদেশের দাসী।
১৮৪০/ ৪১ ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইটালি, গ্রীস, তুরস্ক; ড্রেসডেন ও লাইপজিগ (তখন এগুলি আলাদা আলাদা নগরর াষ্ট্র ছিল, আজকের মতো জার্মানি বলে একটি দেশের অঙ্গীভূত ছিল না) ঘুরে বল্কান দেশগুলির মধ্যে দিয়ে ফিরলেন।
১৮৪২ ভ্রমণ কাহিনী কবির বাজার।
১৮৪৩ বেড়াতে গেলেন ফ্রান্স ও জার্মানিতে ; জার্মানিতে জেনি লিন্ড-এর সঙ্গে স্বল্পস্থায়ী প্রণয়।
১৮৪৩/৪৮ পাঁচটি গল্পসংগ্রহ
১৮৪৪ পুনরায় জার্মানি ভ্রমণ। বারবার গেছেন জার্মানিতে, এখান থেকেই তাঁর খ্যাতি আরম্ভ হয়েছিল---যদিও নিজের দ্বিতীয় স্বদেশ বলতেন ইটালিকে। নিমন্ত্রণ পেলেন ডেনমার্কের রাজা অষ্টম খ্রিস্টিয়ানের কাছ থেকে।
১৮৪৫/৪৬ জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, ইটালি ভ্রমণ। প্রুশিয়ার সম্রাট ফ্রীডরিশ চতুর্থ উইলহেল্ম - এর কাছ থেকে 'নাইটহুডঅব দ রেড ঈগ্‌ল' উপাধি পেলেন।
১৮৪৭ আত্মজীবনী আমার জীবনের সত্যি গল্প। ইংলন্ড ও স্কটলন্ডভ্রমণ। চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে আলাপ হল।
১৮৪৮ উপন্যাস দুই ব্যারনেস।
১৮৪৮ সুইডেনের রাজা প্রথম অস্কার -এর নিমন্ত্রণে সুইডেন ভ্রমণ।
১৮৫১ ভ্রমণকাহিনী
১৮৫১/ ৫২ জার্মানি, ইটালি, সুইজারল্যান্ডভ্রমণ।
১৮৫২/৫৩ দুটি গল্পসংগ্রহের প্রকাশ
১৮৫৪ জার্মানি ও ইটালি ভ্রমণ।
১৮৫৫ জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডভ্রমণ। জুরিখে ভাগনার -এর সঙ্গে পরিচয় হল। দ্বিতীয় আত্মজীবনী আমার জীবনের র ূপকথা।
১৮৫৬ জার্মানি ভ্রমণ।
১৮৫৭ /৭২ রূপকথা ও গল্পের এগারোটি সংকলন প্রকাশিত হল।
১৮৫৯ ব্যাভারিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ম্যাক্সিমিলিয়নের কাছ থেকে বিশেষ সম্মান --'দ ম্যাক্সিমিলিয়ান অর্ডার অব আর্ট অ্য ান্ডসায়ান্স'।
১৮৬০ জার্মানি ও সুইজাল্যান্ডভ্রমণ।
১৮৬১ ইটালি ভ্রমণ। রোমে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙের সঙ্গে পরিচয়।
১৮৬২/৬৩ সুইজারল্যান্ড, স্পেন, মরক্কো ও ফ্রান্স ভ্রমণ।
১৮৬৫ রাজা পঞ্চাদশ কার্লের নিমন্ত্রণে সুইডেন ভ্রমণ।
১৮৬৬ আমস্টার্ডম ও প্যারিস হয়ে পর্টুগালে বেড়াতে গেলেন।
১৮৬৭ দুবার গেলেন প্যারিসের বিশ্ব প্রদর্শনীতে। জন্মস্থান ওডেন্সে শহরের সম্মানিত নাগরিক নির্বাচন করা হল তাঁকে, উপাধি পেলেন 'ফ্রীডম অব ওডেন্সে' (৬ ডিসেম্বর)
১৮৬৮ কোপেনহাগেনে পরিচয় হল জার্মান সুরকার য়োহানেস ব্রাহ্‌ম্‌স -এর সঙ্গে। ঘুরে এলেন হল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজ ারল্যান্ড, জার্মানি। ১৮৬৯-৭০ ভিয়েনা ও রিভিয়েরা ভ্রমণ।
১৮৭০ তাঁর শেষ উপন্যাস, ভাগ্যবান বন্ধু। ইবসেনের সঙ্গে পরিচয় হল।
১৮৭১ নরওয়ে ভ্রমণ।
১৮৭২ জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, ইটালি ভ্রমণ।
১৮৭৩ সুইজারল্যান্ডভ্রমণ---এই শেষবার বেড়াতে বিদেশ যাওয়া।
১৮৭৫ কোপেনহাগেনের পাশে রোলিগেড গ্রামে মৃত্যু (৪ আগস্ট)। কোপেনহাগেন ক্যাথিড্রালে শেষকৃত্য (১১ আগস্ট)

গ্রন্থঋণ

হান্স আন্ডেরসেন'স ফেয়ারি টেস্‌স। মার্গারেট ডবলিউ. জে. জেফ্রি অনূদিত
হান্স ত্রিশ্চিয়ান আন্ডেরসেন দ স্টোরি অব হিজ লাইফ অ্যান্ড ওয়র্ক। ই. ব্রেড্‌স্‌ডর্ফ দ ডায়েরিজ অব হান্স ত্রিশ্চিয়ান অ ান্ডেরসেন। প্যাট্রিশিয়া কনরয় ও সোয়েন রোসেল অনূদিত ও সম্পাদিত। এ বইটির ভূমিকাটি বিশেষ মূল্যবান।
ওয়েবসাইট থেকে আন্ডেরসেন বিষয়ক বেশ কয়েকটি গুত্বপূণ প্রবন্ধ সংগ্রহ করে দিয়েছেন তণ বন্ধু শৌনক চত্রবর্তী।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com